দৈনিক ইত্তেফাক

10 SEP 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শতভাগ সাক্ষরতা অর্জনে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে দায়িত্ব পালনে আগাইয়া আসিতে হইবে

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০০৯ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অন্তত একটি শিশুকে অক্ষরজ্ঞান দিয়া সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের জন্য সকল শিক্ষিত মানুষের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে সকলের মধ্যে শিক্ষার আলো বিতরণে গণজাগরণ সৃষ্টির কোন বিকল্প নাই। ১৯৬৭ সাল হইতে আমাদের দেশে সাক্ষরতা দিবস পালিত হইয়া আসিতেছে। সেই অনুযায়ী এতদিনে দেশ সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষরমুক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু নির্মম বাস্তবতা হইল, আমাদের অর্ধেক লোক এখনও নিরক্ষর। বাংলাদেশে সাক্ষরতার গতি এতটাই শ্লথ যে, তাহা শতভাগ পূর্ণ করিতে বহু বৎসর লাগিয়া যাইবে। এজন্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নানা কর্মসূচি বাস্তবায়নের পাশাপাশি ব্যাপক মানুষকে সাক্ষরতার আওতায় আনিতে শিক্ষিত লোকের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি খুবই জরুরি। বিশেষত স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করিতে পারে। তাহারা ফাইনাল পরীক্ষার পর অবসর সময়ে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ আন্দোলনে। নিজের ক্যারিয়ার গঠনের সঙ্গে সঙ্গে জাতি গঠনে ছাত্রজীবন হইতেই তাহাদের এরূপ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন একান্ত প্রত্যাশিত। এজন্য তাহাদেরকে উৎসাহিত ও উদ্দীপ্ত করিতে তাহাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সাক্ষরতামূলক কাজের বিশেষ মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

সরকারের হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ৬২ শতাংশ। কিন্তু পর্যবেক্ষকগণ মনে করেন, খাতা-কলমের হিসাব আর বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক বিদ্যমান। কেবল নাম স্বাক্ষর করিতে পারাটাই সাক্ষরতার পরিচয় বহন করে না। সাধারণভাবে ইহার উদ্দেশ্য হইল মানুষকে লেখাপড়া ও হিসাব-নিকাশে ন্যূনতম দক্ষ করিয়া গড়িয়া তোলা। মানবিক চেতনায় উদ্দীপ্ত এবং স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করা। তাই বর্ণ পরিচয় ও নাম দস্তখতে সাক্ষরতার শতভাগ সাফল্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। তাহাছাড়া কতজন মানুষ সাক্ষরতা অর্জন করিয়া আবার বর্জন করে বা হারায় তাহার কোন হিসাব নাই। তাই এক্ষেত্রে ২০০৭ সালের ইএফএ গ্লোবাল রিপোর্টকেই অধিক যুক্তিযুক্ত বলিয়া ধরা যাইতে পারে। সেই রিপোর্ট অনুসারে বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ৪২ দশমিক ৬ শতাংশ। অর্থাৎ দেখা যাইতেছে সরকারি হিসাবে সাক্ষরতার হার প্রবৃদ্ধিতে আছে শুভংকরের ফাঁকি। ইহাছাড়া দরিদ্র পরিবারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশী থাকার কারণেও সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তেমন একটা হেরফের হইতেছে না। এভাবে আমাদের তথাকথিত সাক্ষরতা বিপ্লব কোথায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার তিন যুগ পরেও আমরা আমাদের জনগোষ্ঠীকে বিপুলহারে শিক্ষিত করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারি নাই- ইহার চাইতে বড় ব্যর্থতা আর কি হইতে পারে। অথচ বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত ঐতিহাসিক ৬ দফার অন্যতম প্রধান দাবী ছিল সবার জন্য শিক্ষা। যাহা হউক, দেশী-বিদেশী অর্থে পরিচালিত নানা প্রকল্প ও কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াও আমরা কেন কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করিতে পারি নাই তাহার পর্যালোচনা একান্ত দরকার। সাধারণত রাজনৈতিক কারণে সাফল্যের জাহির করিতে গিয়া বরাবরই সাক্ষরতার হার ফুলাইয়া-ফাঁপাইয়া উপস্থাপন করা হইয়াছে। গণশিক্ষার নামে এ যাবৎ বাস্তবায়িত হইয়াছে প্রায় দুই ডজন প্রকল্প। কিন্তু সেসবও ছিল আড়ম্বরপূর্ণ ও কিতাবি কর্মসূচীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইহাছাড়া বহু এনজিও বয়স্ক শিক্ষার নাম করিয়া ব্যাপক দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হইয়াছে। আমাদের দেশে নব্বই দশকের পর প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও সার্বজনীন করা হয়। অতঃপর গড়িয়া ওঠে পৃথক মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অধিদপ্তর। কিন্তু তাহার পরও কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়া যাইতেছে না। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষায় ড্রপ আউটের হার ৪৮ ভাগ। সাক্ষরতা উত্তর অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প, দুরতিগম্যদের শিক্ষা বা হাউ-টু-রিচ প্রকল্প, স্যাটেলাইট স্কুল, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা, উপবৃত্তি প্রকল্প প্রভৃতি হাতে নেওয়ার পরও যদি এই হয় বাস্তবতা তাহা হইলে সরকারি অর্থ অপচয়ের জন্য একদিন সমালোচনার ঝড় উঠিবেই।

আমরা মনে করি, সাক্ষর সমাজ নির্মাণে কোন দাতাগোষ্ঠী, বিশেষ এনজিও ও কেবল আমলাদের ওপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। জনগণের মধ্যে মর্যাদাবান জাতি গঠনের ইচ্ছা জাগাইতে হইবে। স্বাধীনতার সূচনালগ্নে ১৯৭৩ সালেই সব প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে এই উদ্যোগকে কেন যথেষ্ট সম্প্রসারিত করা যায় নাই তাহা একটি বড় প্রশ্নই বটে। আজও ১৯ হাজার গ্রামে সরকারি তো দূরে থাকুক, কোন বেসরকারি প্রাইমারি স্কুলেরও অস্তিত্ব নাই। তাহাছাড়া ১৯৭২ সালেই দেশ গড়ার প্রত্যয়ে গড়িয়া উঠিয়াছিল অসংখ্য নাইট স্কুল। কিন্তু এসব নাইট স্কুল শেষ পর্যন্ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবেই কাঠামোধীন রূপ লাভ করিতে ব্যর্থ হয়। নাইট স্কুলের পুন:প্রবর্তন করিয়া তাহাতে বিনা বেতনে বা সামান্য সম্মানীতে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পৃক্ত করা যায় কিনা সে ব্যাপারে ভাবিয়া দেখা একান্ত দরকার।

বর্তমান সরকার ২০১৪ সালের মধ্যে শতভাগ সাক্ষরতা অর্জনে বদ্ধপরিকর। যেখানে গত ৫০ বৎসরে সাক্ষরতার হার মাত্র ২০ শতাংশ বাড়িয়াছে সেখানে আগামী পাঁচ বৎসরে শতভাগ সাফল্য অর্জন নিঃসন্দেহে চ্যালেঞ্জস্বরূপ। এজন্য প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করিতে হইবে। কে কয়জন ব্যক্তিকে নিরক্ষরতামুক্ত করিতে পারে এ ব্যাপারে নিয়মিত প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করিতে হইবে। বর্তমানে ১৫ বৎসরের উর্ধ্বে নিরক্ষরতার হার ৫১ শতাংশ বিধায় বয়স্ক লোকদের সাক্ষরতার ব্যাপারে নতুন করিয়া চিন্তা-ভাবনা করিতে হইবে। সরকার ইতিমধ্যে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমও জোরদার করিয়াছে, যাহা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করিবে নিঃসন্দেহে। আমরা মনে করি, সঠিকভাবে সাক্ষরতা হইল শিক্ষার প্রধান সোপান। তবে শুধু সাক্ষরতায় লাভ হইবে না। পর্যায়ক্রমে আরো অধিক জ্ঞানার্জনের সুযোগ দিয়া প্রতিটি নাগরিককে যোগ্য করিয়া গড়িতে তুলিতে হইবে। তাহাকে একুশ শতকের বহুমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম হইতে হইবে। বর্তমানে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের প্রক্রিয়া চলিতেছে। তাই সার্বজনীন সাক্ষরতা অর্জনে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন সুসমন্বিত ও বৈষম্যহীন প্রাইমারি স্কুল চালু রাখা সম্ভব হয়।